Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 267 – 275
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নির্বাচিত আধুনিক বাংলা কবিতায় শিশু-প্রসঙ্গ : অধিকার থেকে রহস্যলোক

জয়ন্ত পাল
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : **pauljayanta950@gmail.com**

Keyword
নবজাগরণ, সমাজ, অভিভাবক, সনদ, নিরাপত্তা, জড়, চৈতন্য, মনোজগত।

Abstract
শিশুকে নিয়ে শিশুর স্বাধীন বিকাশের গুরুত্ব নিয়ে ভাবনাচিন্তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। নবজাগরণেরই পর সারা বিশ্বে এ নিয়ে একটা আলোড়ন তৈরি হয়। শিশুকে অভিভাবক এবং সমাজ উভয়ের কাছেই যে নির্যাতন সহ্য করতে হয় তা থেকে তাকে উদ্ধারের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে সনদ পেশ করা হয়। আধুনিক বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ'-এর পর অনেক দূর হেঁটেছে। শিশুর শিক্ষা, শারীরিক মানসিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে তারা কবিতা লিখেছেন। আবার শিশুর আধ্যাত্মিক গুরুত্বের মূল অনুসন্ধানের জন্য আমরা প্রখ্যাত মনোবিদের শিশুর মনোজগৎ নিয়ে গবেষণার দ্বারস্থ হয়েছি। সেখান থেকে জড় ও চৈতন্যের দ্বান্দ্বিকতার সূত্রে এক চৈতন্যময় জগত অনুমিত হয়েছে যাতে শিশু ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলা কবিতাতেও এই শিশুকেন্দ্রিক অধ্যাত্মবাদ নানাভাবে রসময় মূর্তি লাভ করেছে।

Discussion

১

আমাদের এই ভুবনে শিশুর আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে এক রহস্যের ইশারা ঘনিয়ে ওঠে।যে জৈব তাড়না এবং জড়জগত শিশুর উৎপত্তির কারণ শিশু মধুরতা ও সৌন্দর্যে তাদেরকে অনেক দূর ছাড়িয়ে যায়। আমরা মনে করি শিশু আমাদের অগম্য অমৃতলোক থেকে আলোক উৎস বয়ে নিয়ে আসে।কিন্তু এহেন শিশুকেও একান্ত বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতিতেই বড় হতে হয়। ফলে সমাজের ব্যাধি, সমাজের কুটিল প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং নির্বোধ অমানুষী ষড়যন্ত্রগুলো শিশুকেও সমানভাবে আক্রান্ত করে।সেই নির্মম সমাজশক্তির কাছে শিশুর অনাবিল সরলতা ও সৌন্দর্যের কোন মূল্য নেই, বরং শিশুর জীবনে সে নানাভাবে খুব সহজেই বিপর্যয় ঘনিয়ে আনতে পারে, কারণ শিশু অপরিণত, আত্মরক্ষার মত শক্তি তার অনায়ত্ত। রবীন্দ্রনাথ তাই "শিশু" কাব্যগ্রন্থে শিশুর অপার রহস্যকে তুলে ধরলেও' শিশু ভোলানাথ' এর 'রবিবার 'কবিতার শিশুটি শ্রেণিসচেতনার জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না—

"সে বুঝি মা, তোমার মতো/ গরিব ঘরের মেয়ে?"[১]

আর ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় শিশুর অধিকাররক্ষার প্রশ্নটি যা সমাজতত্ত্বের একটি বহু-আলোচিত বিষয়। শিশুর অধিকার রক্ষাচর্চার ইতিহাসটিকে সন্ধান করলে দেখা যায় শিল্পবিপ্লবের আগে পর্যন্ত শিশুর অধিকাররক্ষার ধারণাটি তেমন প্রচলিত ছিল না।শুধু তাই নয়, শিশুকে খুব তাড়াতাড়ি বড়দের পর্যায়ভুক্ত করে ভাবা হত, ফলে তার আলাদা চাহিদার কোন মূল্য ছিল না। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে শিশু শ্রমের প্রশ্নটিকে সামনে রেখে শিশুর অধিকাররক্ষার ধারণাটি গুরুত্ব পায়। তবুও সেই অধিকাররক্ষার প্রশ্নেও শিশু নিজে যে ক্ষমতাহীন, সে নিছক অভিভাবকের হাতের পুতুল এই কথাটিই বেশি করে বাজত। বিশ শতকে এসে তবে শিশুর অধিকাররক্ষার প্রশ্নে শিশুর আত্মনিয়ন্ত্রণের মত দিকটি সংযুক্ত হয়ে গুরুত্ব পায়।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা "Convention on the rights of the child (CRC)" গ্রহণ করে।এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে শিশুর অধিকারের নানা দিকগুলি তুলে ধরা হয় ।এখান থেকে কয়েকটি দিক আলাদা করে তুলে নেওয়া যেতে পারে।যেমন সাম্যের প্রশ্নটি Article 2-এর প্রথম ধারায় এসেছে এইভাবে –

> "States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status."[২]

অর্থাৎ,ধর্ম,বর্ণ,জাতি,বিত্ত,লিঙ্গ ইত্যাদি কোনকিছুর দিক থেকেই শিশদের মধ্যে বৈষম্যমূলক বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যাবে না।মনে রাখতে হবে এই বিধান এই Convention স্বাক্ষর করবে যে রাষ্ট্রগুলি তাদের দিকে তাকিয়ে।কিন্তু কেবল রাষ্ট্র সচেতন হলে তো হবে না,সার্বিকভাবে গোটা সমাজের বিভিন্ন স্তরকে সচেতন হতে হবে।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই,কিন্তু তার পাশাপাশি যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষাও গুরত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না।Article-27-এর প্রথম ধারায় তাই বলা হয়েছে –

> "States parties recognise the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral and social development."[৩]

খেয়াল করলে দেখা যাবে কেবল শরীর-স্বাস্থ্য রক্ষা নয় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আর বলা বাহুল্য সমাজের কলুষ শিশুজীবনকে যাতে আচ্ছন্ন না করে সেদিকটা দেখতে হবে।

শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ দিক।কিন্তু সেই শিক্ষাকে ফলবতী করার জন্য যথোপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে।Article-29-এর প্রথম ধারায় তাই বলা হয়েছে-

> "State Parties agree that the education of the child shall be directed to a) the development of the child's personality, talents and mental and physical abilities to their fullest potential..."[৪]

অর্থাৎ চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা নয়,বিকাশের পক্ষে উপযোগী জীবনমুখী শিক্ষা দরকার।সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে Article-26-এর প্রথম ধারায় বলা হয়েছে–

> "States Parties shall recognise for every child the right to benefit from social security, including social insurance, and shall take the necessary measures to achieve the full realization of this right in accordance with their national law."[৫]

কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে কতগুলি বিধি কেবল সুত্রবদ্ধ করলেই হয় না, সেগুলো যাতে বাস্তবে কার্যকরী হয় তার জন্য যথেষ্ঠ উদ্যম ও সক্রিয়তাও বাঞ্ছনীয়। শিশুর অধিকাররক্ষার ধারণা কেবল আইনের নয় তা সাধারণের মানসিকতায় পরিব্যাপ্ত হতে হবে। কিন্তু যাপন অত সহজ সরল নয়। শিশুর অধিকার সুরক্ষার কথা বললেও অনেক সময়েই সমাজ নানা দ্বিচারিতায় নিযুক্ত থাকে। আর কবিদের কলমে ধরা থাকে শিশু ও সমাজের সম্পর্কের সেই নানা ছবি।

শিশুর জীবনে নিরপত্তার কথা হচ্ছিল ,কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় পাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কীভাবে শিশুর সরল জীবনকেও আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। রাষ্টীয় সন্ত্রাসের প্রহরীরা শিশুর কাছে বড়জোর রূপকথার ভিলেন চরিত্রগুলি। সে তাদেরকে ওভাবেই দেখে। বাঘ, সাপ ইত্যাদির রূপকে শিশুর সামনে এই বিপদ হাজির হয়। কিন্তু রূপকথার জগতের অশুভের বিনাশ আর শুভের জয় এরকম যে বিশ্বাস শিশুর থাকে এখানে তা বাধাগ্রস্ত হয়। শিশু তার অভিজ্ঞতায় এখানে তাই অনুভব করতে পারে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বাঘ সাপের তুলনায় অনেক বড় ব্যাপার। রূপকথার মন্ত্রে শিশুকে উজ্জীবিত করা হয় যাতে শিশু বাধার সামনে ভয় না পায়, বাধাজয়ের আশায় বুক বাঁধতে পারে কিন্তু এখানে সমাজ শিশুর সেই রূপকথার জগতকে ভেঙে দিয়ে ভয় দেখনোর গল্প বলে—

"ছোট মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে বলে,' মা
তুমি ভয় পেও না!'
'মা মণি, তুই চুপ কর। বাইরে
দরজা ছিঁড়ছে বাঘ।'
'আমার বাবা বাঘ তাড়ানোর মন্ত্র জানে
আমার দাদা বাঘ তাড়ানোর মন্ত্র জানে।' ...
বলতে বলতে মা
দেখেন মেয়ে দারুণ ভয়ে পাথর,চোখে পলক পড়ে না!
ঘরে-বাইরে কোথাও একটু বাতাস নড়ে না।"[৬]

পথশিশুদের অসহায়তাও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চমৎকার ফুটে উঠেছে। কবি তাদের সম্বোধন করেছেন 'ন্যাংটো ছেলেটা'। এমনি এক ন্যাংটো ছেলের ফুটপাথে ঘর, আহার বলতে বাতাস খেয়েই সে পেট ভরায়। সে ফুটপাতে থেকে হাজার মানুষের জীবনপ্রবাহকে দেখতে থাকে।দেখতে থাকে সবাই কত ব্যস্ত, নিজেদের জীবনের রাজত্বটুকু পেতে সব সময়ে ছুটছে। তারা নিজেদের নিয়ে এক মহাজগত গড়ে নিয়েছে, সেখানে অনেক ঐশ্বর্য অনেক তারকা-সমাগম। তাই সবাই যেন চাঁদ, সূর্য, তারাদের চাষ করছে। অথচ এই সর্বহারা দীনদুঃখী ছেলেটা এদের এই ক্যানভ্যাসে বড্ড বেমানান। প্রান্তবাসী হয়ে সে অন্ধকারে হারিয়ে যাক এমনটাই চায় এই চলমান ব্যস্ত শহুরে জীবন। ন্যাংটো ছেলে তাই এককোণে পড়ে থেকে সব কিছু দেখে যায়,এছাড়া আর কিছুই তার করার নেই। চূড়ান্ত শ্লেষ ভরে কবি তাই উচ্চারণ করেন-

"দূর থেকে তাই
দেখছে দৃশ্য
দেখছে এবং
দিচ্ছে সাবাশ!"[৭]

এই ন্যাংটো ছেলেটার জীবনে আর কিছু না থাক বহুদিনের খিদে আছে। ক্ষুধাতুর এমনি দুটি শিশুর কথা পাই অমিতাভ দাশগুপ্তর 'ভাইবোন' কবিতায়। সেখানে ভাই বোন দুটির ঘরে এগারোদিন টানা কোন খাবার নেই। তারা বাধ্য হয়ে তখন দেহাতি হাটে বেরিয়ে পড়েছে যাতে বিক্রেতাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেখান থেকে কিছু খাবার সরানো যায়। আনাজ ও ফলওয়ালারা সতর্ক, তারা বুঝতে পারে বহুদিনের না খেতে পাওয়া এই দুটি ছেলেমেয়ে তাদের পশরা থেকে কিছু জিনিস সরিয়ে নিতে চায়। তবে ভাইবোনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের অন্তরে তখন লুঠেরার মনোভাব।দিনের শেষে অনেক কিছু হাতিয়ে তারা যখন ফেরে তখনও কিন্তু তাদের চোখে ভবিষ্যতের ভাবনা। এক টুকরো ফিল্মশটের মত কবি দেখিয়ে দেন-

"সূর্যাস্তের আল বেয়ে যেতে যেতে
একটি শশায় দুজনে বসাই দাঁত,
বোনের কোঁচর পোয়াতির মতন ভারি,
ভাইয়ের দুচোখে অমাবস্যার রাত।"[৮]

জীবনের অভিজ্ঞতা, পরিস্থিতি এই দুই ভাই বোনকে তাদের বয়সের থেকে অনেক বড় করে দিয়েছে। স্তবকটির শেষ দুটি পঙক্তির তেমনটাই অর্থ।

কবি অরুণ মিত্র এই খিদেকে তাঁর 'শিশু' কবিতায় একটু অন্যভাবে এঁকেছেন। সেখানে কোন চিহ্নিত বিশেষ শিশু নয় বরং একটি শিশু আসে এমন কথা বলার মধ্য দিয়ে সকল ক্ষুধিত শিশুকে একটি শিশুর মূর্তিতে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই শিশুটি কোথা থেকে আসে এই প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন এরা আস্তাকুঁড়, ফুটপাত কিংবা ধ্বসা দাওয়া থেকে আসে যেখানে সারাটা দিন জ্বলতেই থাকে আর রাতের বিশ্রামগুলোও খুব ছোট। শিশুটির অনন্ত ক্ষুধা, তার গায়ে দহনবেলার আঁচ। কবি শিশুটির জন্য সহানুভূতি অনুভব করেন, কিন্তু সেই সহানূভূতি শিশুটির খিদে মেটাতে ব্যর্থ। কবিতায় দেখা যায় কবি একজন সমাজকর্মী। কবিতার জাদুতে তিনি বেধেঁ ফেলতে পারেন সাধারণ মুহূর্তগুলি। কিন্তু সেই জাদুবাস্তবতার আখরগুলি শিশটির খিদে মেটায় না। চারিদিকে যখন পোশাক পরিহিত সভ্যতার শান্তি ও সুশীতলতার আলো, শিশটি তার নাড়ির ক্ষুধা নিয়ে, গায়ের তাপ নিয়ে পুড়ছে। কবি উচ্চারণ করেন- "...আহা নিষ্পাপ শিশু! কিন্তু সে কী করবে? আহা নিষ্পাপ - কিন্তু সহানূভুতি সে খেতে পারে না দরদ সে খেতে পারে না। খিদে খিদে খিদে। এত শব্দ আর অক্ষরের ফাঁকে তার চিৎকার এখানে আগুনে"[৯] আমাদের সুসজ্জিত সভ্যতার আড়ালে অভুক্ত এবং অসহায় শিশুটি এ কবিতায় প্রকট হয়ে পড়েছে।

শিশুর ওপর এই তীব্র আঘাত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে আরো নিদারুণ এক সত্য। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'তৃতীয় বিশ্ব' কবিতায় তাই মায়ের কাছে বসে শিশু সংগ্রামের শপথ নেয়।যে বিরূপ বিশ্ব তাকে আর তার মাকে বাঁচতে দেয় না, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে শিশু মুক্তি ছিনিয়ে আনতে চায়। এই কবিতাটি লক্ষ করলে অনুভব করা যাবে,শিশু ও মা একত্রে নিজেদের নিভৃত একটি পরিসর গড়ে তুলেছে। এই নাড়ির বন্ধনই যেন স্বতন্ত্র এক বিশ্ব।কবি উচ্চারণ করেছেন-

"সান্তনাময় শিশু এখন আবজে আছে মাকেঃ
'আজকে নেই তো রুটি,
কাল আমি ঠিক তোমার জন্য মুক্তি নিয়ে এসে
হাসতে হাসতে বন্দিশালায় যাব--" [১০]

এখানেও রুটির জন্য আর্তনাদ। কিন্তু কেবল রুটি তো নয়, শিশুর ওপর কখনো ঘটে যায় মারাত্মক যৌন নিপীড়ন। সমাজে বিশেষভাবে বালিকারা নিরাপদ নয়। শামসের আনোয়ার তাঁর এক কবিতায় দেখান কীভাবে বালিকার কোমল শরীরে লোভী কুমীরদের দাঁত বসে-

"তার ঊরু দুটি ছিল একটি অকর্ষিত পশ্চাৎ-ভূমি
অনন্ত শৈশব এবং সারল্যে ভরা
মাছেদের সঙ্গে খেলা করতে ভালোবাসতো সে,চাইতো
যে তার খোলা জাং-এর ওপর
স্বাভাবিক, ছোট পাখিরা নেচে বেড়াক!
দন্তুর কুমীরের দল তাকে কামড়ে ধরতো বার-বার
মাছেদের ছদ্মবেশে এসে"[১১]

CRC-তে আমরা দেখেছি শিশুর ব্যাপারে সাম্য যাতে বজায় থকে সেদিকটা দেখার কথা বলা হয়েছে।এই অনুযায়ী সমাজ প্রত্যেক শিশুর জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এমনটাই কাম্য। কিন্তু বাস্তবে আমাদের আর পাঁচটা সাধারণ জিনিসের মতন শিক্ষাকেও বিক্রয় করা হয়, আর তাই তারও বেশি দামি, কম দামি এমন বিভাজন রয়েছে। বড়লোকের ছেলেরা বেশি পয়সা খরচ করে ভাল স্কুলে পড়বে আর গরীব সন্তানের স্থান হবে নিম্নমানের স্কুলে। এই ভাবে আমাদের কাছে প্রতিটি শিশুই সমান নয়। কবি নিশীথ ভড় তাই লিখলেন-

"ওই ছেলেটা চটপটে আর স্মার্ট
কৌতূহলও রয়েছে চারদিকে
ওই ছেলেটা ভালো স্কুলে পড়ে

এই ছেলেটা ঝিমায়

এই ছেলেটার মাষ্টারমশাই ঝিমায়
এই ছেলেটা খারাপ স্কুলে যায়"[১২]

শিক্ষাব্যবস্থার এই বৈষমাই পরবর্তীকালে সমাজের আরো বৃহত্তর বৈষম্যের কারণ হয়। অথচ আমদের উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা এই বৈষম্যকে জিইয়ে রাখার দিকেই।

তবে শিক্ষা কিন্তু সবসময় শিশুর বিকাশের দিকে তাকিয়ে পরিচালিত হয় না। সেই কবে রবীন্দ্রনাথ 'তোতাকাহিনী' লিখেছিলাম কিন্তু আজও অন্তত তাকে অনেক স্থানে শিক্ষার নামে শিশুর ওপর মানসিক নিপীড়ন চলে। ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় আমরা পেয়েছি ছোট্ট শিশুকে কীভাবে অল্প সময়ে একসঙ্গে নানা জিনিস শিখতে বাধ্য করে পচানো হয়। হ্যাঁ,ভাস্কর 'পচানো' এই বিশেষ শব্দবন্ধটিই ব্যবহার করেছেন। আবার জয় গোস্বামীর সেই বিখ্যাত 'টিউটোরিয়াল' কবিতায় দেখি পিতা তার সন্তানের শিক্ষাকে নিজের নিশ্চিত ভবিষ্যতের ভিত্তিরূপে দেখছে। সন্তান শিক্ষিত হয়ে অর্থ উপার্জন করে পিতাকে দেখবে।কিন্তু এ ধরনের ব্যবসায়িক অভিসন্ধি এবং স্বার্থপরতা ঐ শিশটিকে শেষ করে দেয়,কেননা তার মুক্ত প্রাণের সামনে হাজির করা হয় সর্বদা ফার্স্ট হওয়ার দুঃসাধ্য সাধনা। কবি রমা ঘোষ তাই রুশোর এমিলের অনুষঙ্গ এনে শিশুর এই মুক্ত সত্তাটিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে চান। কবি 'রুশোর এমিল' কবিতায় রাখঢাক না করেই বলেছেন শিশুর সুপ্ত মেধাকে সুবিধাবাদী শ্রেণির মানুষ নিজেদের মনের ইচ্ছা অনুযায়ী চালিত করে। তাই এই হৃদয়হীন শিক্ষাব্যবস্থার ওপর শিশুর কোন ভালোবাসা নেই। কবিতার শেষে তাই-

"তিনগুণ কালোমূল্যে কিশলয় সহজবোধিনী
বালকের তিক্ত লাগে, ছিঁড়ে ফেলে পাতা।"[১৩]

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইশকুল' কবিতায় শিশু আবার স্কুলের ভুল শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।সে স্কুল ভেঙে নতুন স্কুল স্থাপনের শপথ নিয়েছে-

"তোমরা আজব লোক, তোমরা বোঝাও ভুল বিল্কুল!
তোমরা বোঝাবে, এই কয়েদখানারই নাম ইশকুল?"[১৪]

শিশু বড় হয় অভিভাবকের ছত্রছায়ায়। প্রতিকূল সমাজের মাঝে থাকলেও অভিভাবক যদি শিশুকে যথার্থ পরিচর্যা দিতে পারে তবে শিশুর জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয়। অথচ কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মমাত্রেই সে অভিভাবকহীন। না, শিশুর অভিভাবকের মৃত্যুর কথা হচ্ছে না, অভিভাবক এখানে শিশুকে জন্মমাত্রেই পরিত্যাগ করে। আমরা তাই খবরে পড়ি শিশুকে কাপড় মুড়িয়ে আস্তাকুঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে।সংবাদপত্রে কিছুদিন আগেও দেখা গেছে এমন অভিভাবকহীন পরিত্যক্ত অনেক শিশুর ছবি; সহৃদয় মানুষের সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করা হয়েছে। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই তো লিখেছেন-

"শিশুগুলি কেঁদে উঠলো এ-ওকে জড়িয়ে
ঘুণধরা অন্ধকার ঘরে;
তাদের পিতারা কবে গেছে জাহান্নামে
যে যার বেশ্যাকে খুন করে..."[১৫]

অন্ধকার ঘুণঘরে থাকা এই শিশুদের জন্য পিতা-মাতার স্বাভাবিক আলোকিত ভালোবাসাভরা জীবন নেই।

আরেকটি দিক হল কন্যাভ্রূণহত্যা। শিশুর শিক্ষার আলোচনার সময় যে অর্থনৈতিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা এসেছে এখানেও সে সক্রিয়।কন্যা হলে তাকে বিয়ে দেবার খরচ আছে, সে পরগৃহে চলে যাবে, অথচ পুত্র লাভজনক, ভবিষ্যত বংশরক্ষার মাধ্যম। যদিও অর্থোপার্জনকারী কন্যা এই ধারণাকে বদলে দিচ্ছে, তবু লিঙ্গভিত্তিক শিশু-নির্যাতনের এই চিত্র বিভিন্ন রূপে বর্তমান। কবিতা সিংহ তাই লিখলেন-

"আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা
জন্ম দিও না মা!
মা আমার জেনে শুনে কখনো উদরে
ধরোনা এ বৃথা মাংস
অযাচিত কখনো ধরোনা।"[১৬]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'চতুর্থ সন্তান' কবিতায় আবার জন্মনিয়ন্ত্রণপ্রণালীর ভিতরকার স্বার্থপরতাকে বিদ্ধ করা হয়েছে।

শেষে বলা যায় বৃহত্তর সমাজ এবং অভিভাবক এদের দুজনকেই শিশুর দায়িত্ব নিতে হবে।এ ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে কেউ যেন দায় ঝেড়ে ফেলতে না চায়।মন্তেস্বরী তাই তার একটি গ্রন্থে বলেছিলেন-

> "And thus the social tragedy of the child takes its course. Society abandons the child, without feeling the smallest responsibility, to the care of his family, and the family, for its part, gives up the child to society which shuts him in school, isolating him from all family control"[১৭]

২

শিশু এবং সমাজে তার অধিকাররক্ষা এই বিষয়টিকে পাশে রেখে এবার আমদের লক্ষ্য শিশুর অন্তর্নিহিত রহস্যলোকটিকে বুঝে নেওয়া। শিশুকে প্রায়ই আমরা ঈশ্বরের কাছের বলে মনে করি। তাকে ঘিরে থাকে একটি পবিত্রতা এবং সৌন্দর্যের ধারণা। আমদের বড়দের পৃথিবীকে সে আরো একটু সুন্দর করে দেয়। শিশুর এই আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমরা শিশুর মনোজগতটিকে মনোবিজ্ঞানীদের অনুসরণে বোঝার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই হল Jean piaget-এর 'The Child's Conception of the World'। শিশুর চিন্তনপদ্ধতি, শিশুর মনোজগতের রহস্যটিকে ধরতে গিয়ে লেখক শিশুর সঙ্গে আমাদের বড় মানুষের পার্থক্যটিকেও সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটির তিনটি বিভাগ অর্থাৎ তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুর জগতটিকে তুলে ধরা হয়েছে- Realism, Animism এবং Artificialism। এই প্রতিটি বিভাগই কিন্তু পরস্পর-সম্পর্কিত, তবে শিশুর রিয়ালিজম কেমন অথবা শিশুর বস্তুজাগতিক বিষয়ে ধারণা কেমন তার ওপরেই সমগ্র আলোচনাটির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। পরিণত বড়মানুষ আত্মকে বা সত্তাকে বাইরের বিশ্বজগত থেকে আলাদা করতে পারে।সে যদি বিষয়ী হয় তবে তার মনে বাইরের বিশ্বজগতের বিষয় হিসাবে একটি সুস্পষ্ট পৃথক অস্তিত্ব আছে।কিন্তু শিশুর আত্মবোধ নিজেকে এতটা সুস্পষ্টভাবে বিশ্বজগত থেকে পৃথক করতে পারে না, জগতের বিচিত্র চলমানতায় তার সত্তা যেন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে থাকে।মনোবিজ্ঞানীর ভাষায়-

> "For us, an idea or a word is in the mind and the thing it represents is in the world of sense perception. Also words and certain ideas are in the mind of everybody, whilst other ideas are peculiar to one's own thought. For the child, thoughts, images and words, though distinguished to a certain degree from things, are none the less situated in the things. The continuous steps of this evolution may be assigned to four phases : (1) a phase of absolute realism, during which no attempt is made to distinguish the instruments of thought and where objects alone appear to exist; (2)a phase of immediate realism, during which the instruments of thought are distinguished from the things but are situated in the things; (3) a phase of mediate realism, during which the instruments of thought are still regarded as a kind of things and are situated both in the body and in the surrounding air; and finally (4) a phase of subjectivism or relativism, during which the instruments of thought are situated within ourselves. In this sense then, the child begins by confusing his self-or his thought-with the world, and then comes to distinguish the two terms one from each other"[১৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিশু শুরু করে 'absolute realism' দিয়ে যা পরবর্তী দুটি স্তরেও বেশ ভালোরকম প্রভাব রেখে যায়। জীবনবিকাশের এই বিশিষ্ট ধরনের জন্য, আলোচ্য গ্রন্থে piaget বিভিন্ন শিশদের কাছ থেকে যে সব প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভাবনাগুলি পেয়েছেন সেগুলিতেও শিশুর আত্মন বিকাশের অভাব দেখা যায়। এগুলিকে piaget-এর তত্ত্বভাবনার প্রমাণ বলা যায়। একটি ক্ষেত্রের উদাহরণ কেবল আমরা দিতে পারি। Nominal Realism-এর বোধ শিশুদের মধ্যে কীভাবে থাকে তা শিশুদেরকে প্রশ্ন করে বিজ্ঞানী জানতে পারলেন প্রথম স্তরে শিশুরা মনে করে বস্তুর নাম বস্তুজগতের মধ্যেই থাকে অর্থাৎ সূর্য চন্দ্র এই নামগুলি ঐ ঐ বস্তুগুলির মধ্যেই রয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে শিশু ঐগুলি যে মানুষের থেকে আসে একথা ধারণায় আনতে পারে বটে কিন্তু ঐগুলি যেন বস্তু দিয়েই তৈরি হয়।একমাত্র তৃতীয় স্তরে নাম যে বস্তুজগত থেকে স্বতন্ত্র এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হল শিশুকে আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলার সাথে এই মনোবৈজ্ঞানিক

সত্যের সম্পর্ক কী? আসলে এই বিশ্বজগত জড় না চেতন এই প্রশ্নের সামনে আধ্যাত্মিকতা চেতনের দিকেই তার বক্তব্য রাখতে চায়। যাকে জড় মনে হচ্ছে সেও আসলে চৈতন্যের স্পর্শে সঞ্জীবিত। এই বিশ্বে এক সূক্ষ চৈতন্যময় সত্তা ব্যাপ্ত হয়ে আছে আর তৃণ থেকে নক্ষত্র পর্যন্ত তার স্পন্দন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে আমরা শুনতে পাই তিনি বলছেন তাঁর একেক সময় মনে হয় সারা পৃথিবীটা চৈতন্যে মাখানো আছে। কিংবা তাঁর ওই কথাটা যে বস্তুজগতের নড়াচড়া ঠিক যেন হাঁড়ির ভিতরের আলু পটলের মতন, তলায় চৈতন্যরূপ আগুন কাজ করছে।বিশ্ব জুড়ে এই যে সূক্ষ চৈতন্যের কথা যার মূল সার হল আপাত জড়ও আসলে চেতনাসম্পন্ন তা শিশুর এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্যের সাপেক্ষে নতুন দিশা পায়। শিশু জড়জগতকে চেতনার জগত বলে মনে করে বা বলা ভালো তার চেতনার জগত জড়ে মিশে অবস্থান করে বলে আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি যে জগত থেকে শিশুর আবির্ভাব তা চৈতন্যসম্পন্ন আর সেখান থেকে শিশু আসে বলেই তার সত্তায় জড় ও চেতন মিলানো মিশানো থাকে।সে এমন এক জগতের বাসিন্দা যা আমাদের পরিণত মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই শিশুকে পবিত্র বলার অর্থই হল শিশু ওই জড়ে ছড়িয়ে থাকা সূক্ষ চৈতন্যজগতের অধিবাসী, যা আসলে আমাদের যাবতীয় ঈশ্বর পরিকল্পনার মূল কথা।

এবার আসা যাক বাংলা কবিতার অঙ্গনে শিশুর এই রহস্যলোক কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে,এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্য, এই আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বাংলা কবিতায় কীভাবে রসময় মূর্তি লাভ করেছে। শিশুর মানদন্ডে এইভাবে যদি পরমসত্তাকে বিচার করা যায় তবে পরমসত্তাকে শিশুর প্রতীকে দেখা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে পাঁচের দশকের কবি সুধেন্দু মল্লিকের 'সঙ্গে আমার বালক কৃষ্ণ' কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে। কবি ঈশ্বরকে অনুভব করেছেন বালকের বেশে। যে ব্যাপ্ত চৈতন্য বিশ্বে স্পন্দিত হচ্ছে, কবি তার অনুভবে পাওয়া অব্যক্ত ইশারাকে শিশুর রূপকল্পনাতেই বুঝতে পারেন। শিশুর মনোবৈজ্ঞানিক সত্যকে মাথায় রাখলে ঈশ্বরকে শিশু বলতেই হবে। 'সঙ্গে আমার বালক কৃষ্ণ'-তে এই ঈশ্বরচেতনা বিভিন্নভাবে ধরা হয়েছে। 'প্রজ্ঞার গোপাল' কবিতায় কবি বলছেন জীবনের যা কিছু দুঃখ শোক ভ্রম সেসব কিছুই সত্যি, সেসব কিছুই প্রজ্ঞার আলো নিয়ে হাজির হয়। আর তখন সেই প্রজ্ঞাদীপিত আলোয় দেখা যায়-

"একটি শিশুর হাত ছুঁয়ে আছে সৃষ্টির অম্বর
চরণ কমলে মুগ্ধ শোকদীর্ণ সহস্র ভ্রমর।"[১৯]

এই যে এখানে বলা হল সৃষ্টির অম্বর ছুঁয়ে আছে একটি শিশুর হাত এটাই শিশু এবং ঈশ্বরকে একাসনে বসিয়ে দেয়। যিনি ঈশ্বর তিনি আসলে আমাদের পরিচিত শিশুর মতন যার কাছে জড় ও চেতনার অর্থ একটি অভিন্ন মাত্রায় হাজির হয়। আরেকটি অসাধারণ কবিতা হল 'আকাশ গোপাল'। কবি বলছেন-

"এই তার ভালোবাসা এই অহেতুক লীলা তার
কেন ডাকে কাকে ডাকে একথা জানে না মহাকাল
হাতের নাড়ুর মতো সহ্য করে পৃথিবীর ভার
সূর্য চন্দ্র ম্লান হয়, সে আমার আকাশ গোপাল"[২০]

গোপালের কাছে এই মহাকাশের মধ্যে ভাসমান পৃথিবীটা নাড়ুর মতন। আকাশের সূক্ষ তন্তুতে সেই ঈশ্বর গোপালের বেশেই বিচরণ করে। আবার শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কাল খুব স্বপ্নের ভিতরে' কবিতায় দেখান একটি শিশুর হাত ধরে তিনি তুষারাবৃত পাহাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। ঈশ্বর যেমন অনন্ত সম্ভাবনার উৎস, তেমনই এই শিশুটির হাত ধরে কবি দেখতে পান কী হবে আর কী হবে না তার যেন কোন সীমালেখা নেই। অর্থাৎ এই শিশুটিও অনন্তের প্রতীক, তাই তার মুখে দিব্য আলো এসে পড়ে –

"কী হয় কী হয় না-বা- তার কোনো সীমালেখা নেই
সেকথা জেনেই আমি উড়ে যাই বহু ডানা মেলে
শিশুটি দাঁড়িয়ে থাকে,মুখে তার দিব্যবিভা পড়ে-
এই ছবি জেগেছিল কাল খুব স্বপ্নের ভিতরে"[২১]

শিশু বা ঈশ্বর আমাদের যে অশেষ বৈচিত্র্যের সামনে এনে ফেলে তার পরিচয় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'যাবতীয় ভালোবাসাবাসি' কবিতাতেও পাওয়া যায়। একেকদিন কবির মনে হয় তার যাবতীয় ভালোবাসার অভিজ্ঞতা শেষ হয়ে গেছে, আর কাউকে ভালোবাসার নেই, আর নতুন কোন জীবনের পথ চলা অবশিষ্ট নেই। মধ্যরাতের বারান্দায় কবি একাকী দাঁড়িয়ে দেখতে পান শহরটা যেন বিশাল জাহাজের মতন ডুবে যাচ্ছে কিন্তু তখনই রাতের আকাশে তারাদের কাঁপুনি কবিকে অনন্তের সামনে এনে ফেলে। আর কবি দেখতে পান-

"কলকাতার এক রাজপথে
যাকে একদিন দেখতে পেয়েছিলুম,
ভাদ্র মাসের আকাশ জুড়ে
উলঙ্গ সেই দৈবশিশুর মুখচ্ছবি তখন আমার
চোখের সামনে ভাসতে থাকে"[২২]

শেষে বলা যায়, শক্তির 'শিশু ঐ, মানুষের উদ্ভিদ' কবিতার কথা যেখানে মানুষের মনের শক্তি আসে এমন এক উদ্ভিদ থেকে যার শিকড়ের অঙ্গুলিতে শিশু কাঁথা মুড়ে শুয়ে আছে। তার কোন বিকার নেই, সে নিদ্রিত, সুপ্ত। বলা বাহুল্য এই উদ্ভিদ এই শিশু আসলে একটি রূপক, একটি ভাবগত সত্যের কথা বলে। মানুষের সত্তা যে আদিম, অব্যক্ত, সূক্ষ প্রাণ থেকে তার আহার্য সংগ্রহ করে তা আসলে ঐ শিশুর মতনই জড় ও চৈতন্য এই উভয় মাত্রায় মিলিত মিশ্রিত থাকে। এখানে বৃক্ষ, বৃক্ষের শিকড়ের শিশু ঐ আদি সর্বব্যাপী প্রাণের প্রতীক যার জড় চৈতন্য এরকম ভেদ নেই। উদ্ভিদ যেমন জড় ও চেতনা মিলে,শিশুও তাই। শিশু বিষয়ক পূর্বোক্ত মনোবৈজ্ঞানিক সত্যটি চমৎকার মিলে যায়।।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবিবার', 'শিশু ভোলানাথ', কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, চৈত্র ১৪০৩, পৃ. ২৪
২. Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 2 (1)
৩. Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 27 (1)
8. Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 29 (1)
৫. Convention on the Rights of the Child, 1989, Article 26 (1)
৬. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, 'ভয় দেখানোর গল্প', 'শিশুর কান্নার ঘর শিশুর স্বপ্নের ঘর', শ্রেষ্ঠ কবিতা, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১১৬
৭. ঐ, 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে', 'ন্যাংটো ছেলে আকাশ দেখছে', শ্রেষ্ঠ কবিতা, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ১১৬
৮. দাশগুপ্ত, অমিতাভ, 'ভাইবোন', 'বারুদবালিকা', শ্রেষ্ঠ কবিতা, চতুর্থ সং, কলকাতা, দে'জ, জুন ২০০৮, পৃ. ৮৯
৯. মিত্র, অরুণ, 'শিশু', 'প্রথম পলি শেষ পাথর', শ্রেষ্ঠ কবিতা, তৃতীয় সং, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৮৮
১০. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, 'তৃতীয় বিশ্ব', 'লঘুসংগীত ভোরের হাওয়ার মুখে', কবিতাসংগ্রহ, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯৬
১১. আনোয়ার, শামশের, 'বালিকা', 'মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে', শ্রেষ্ঠ কবিতা, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৯
১২. ভড়, নিশীথ, 'শিক্ষাব্যবস্থা', 'নিজের পায়ের শব্দ', কবিতা সংগ্রহ, কলকাতা, রাবণ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. 88
১৩. ঘোষ, রমা, "রুশোর এমিল", 'ত্যক্তগ্রহ', কবিতাসংগ্রহ প্রথম খন্ড, কলকাতা, ঋত প্রকাশন, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ৭১

১৪. চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, 'ইশকুল', 'মেঘবৃষ্টিঝড়', স্বনির্বাচিত কবিতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৫০

১৫. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র, 'শিশগুলি কেঁদে উঠলো', আমার রাজা হওয়ার স্পর্ধা, শ্রেষ্ঠ কবিতা, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, দে'জ, আগস্ট ২০০৬, পৃ. ৯৮

১৬. সিংহ, কবিতা, 'ভ্রূণা', শ্রেষ্ঠ কবিতা, তৃতীয় সং, কলকাতা, দে'জ, এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ১২৪

১৭. Montessori, Maria, 'The Secret of Childhood', Translated and Edited by Barbara Barclay Carter, Calcutta, Orient Longmans Ltd, 1951, p. 282

১৮. Piaget, Jean, 'The Child's Conception of the World', Translated by Joan and Andrew Tomlinson, London, Routledge and Kegan Paul Ltd, 1971, p. 126

১৯. মল্লিক, সুধেন্দু, "প্রজ্ঞার গোপাল", 'সঙ্গে আমার বালক কৃষ্ণ', শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সং, কলকাতা, দে'জ, ২০১৭, পৃ. ৬৯

২০. ঐ, "আকাশ গোপাল", 'সঙ্গে আমার বালক কৃষ্ণ', শ্রেষ্ঠ কবিতা, প্রথম সং, কলকাতা, দে'জ, ২০১৭, পৃ. ৮৩

২১. ঘোষ, শঙ্খ, "কাল খুব স্বপ্নের ভিতরে", 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার', কবিতাসংগ্রহ ২, চতুর্থ সং, কলকাতা, দে'জ, বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ২১১

২২. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, 'যাবতীয় ভালোবাসাবাসি', 'যাবতীয় ভালোবাসাবাসি', কবিতাসমগ্র ৩, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ. ১১৮